# বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব

আনুচিং মোগিনি ক্লাসে মন খারাপ করে বসে ছিল। মিলি এসে জিজ্ঞাসা করলো কিরে তোর মন খারাপ কেন? আনুচিং বললো, স্কুলে আসার পথে নদীর ধারে সে খুব একটা বাজে ঘটনা দেখে এসেছে, তাই তার মন খারাপ। মিলি বললো, আমি না তোর বন্ধু, আমাকে বল কী দেখেছিস? মিলি বললো, দেখলাম, নদীতে জেলেরা মাছ ধরার সময় একটি শুশুক (মিঠা পানির ডলফিন) ধরা পড়েছিল! তীরে নিয়ে আসার পর সেখানে অনেক লোক জমে যায়। তারপর একদল দুষ্টু লোক শুশুকটাকে চিনতে না পেরে ভয়ংকর কোন প্রাণী ভেবে মেরে ফেলেছে!

ছবি: শুশুক (মিঠা পানির ডলফিন)

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকে ওদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, আনুচিং তুমি খুবই একটা দুঃখজনক ঘটনা দেখতে পেয়েছো। প্রতিদিনই সারা পৃথিবীতে অসংখ্য বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী মানুষের সচেতনতার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আসলে আজ আমরা এই বিষয় নিয়েই কাজ করবো।

## বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ধ্বংসের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা:

এরপর খুশি আপা সবাইকে নিচের বন্যপ্রাণির ছবিগুলো দেখালেন।

বেঙ্গাল ফ্লোরিক্যান

হায়েনা

ময়ূর

নীল গাই

বনরুই

শ্লথ ভালুক

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন- ছবির পাখি ও প্রাণীগুলো দেখতে কেমন লাগছে?

সবাই একযোগে বলে উঠলো, ছবির প্রাণীগুলো খুবই সুন্দর।

আপা জানতে চাইলেন, এই প্রাণীগুলো কোন দেশে পাওয়া যায়?

এবার সবাই চুপ। আসাদ বললো, আমি এদের মাঝে ময়ূর, ভালুক আর হায়েনা দেখেছি চিড়িয়াখানায়। কিন্তু বাকিদের কখনও দেখি নি। খুশি আপা হেসে বললেন, চিড়িয়াখানায় যাদের দেখতে পাই তারা নয়, প্রকৃতিতে?

তারপর বললেন, কেমন হতো যদি এই প্রাণীগুলো আমাদের চারপাশে সবসময় ঘুরে বেড়াতো? কিন্তু সেটা হয়তো আর কখনোই সম্ভব হবে না, কেননা এই প্রাণীদের আর বাংলাদেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাংলাদেশে এদের আর একটি প্রাণীও বেঁচে নেই, এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ অল্প কিছু দিন আগেও এদের অনেকেই বসবাস করতো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ধরা যাক ময়ূরের কথা। মাত্র ১০০ বছর আগেও এরা কাক বা শালিখের মতো ঘুরে বেড়াতো সাভারসহ সারাদেশের শালবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে।

এবার খুশি আপা একটু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো কেনো এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীরা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল? উত্তরে সবাই আবারো চুপ করে রইলো। শুধু শফিক বললো, মনে হয় মানুষ অনেক গাছপালা কেটে ফেলাতে বন্যপ্রাণিগুলো থাকার জায়গা না পেয়ে অন্য দেশে চলে গেছে। খুশি আপা এ বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, এসো আবারও আমরা কয়েকটা ছবি দেখি।

ছবির নাম:.....

ছবির নাম:.....

ছবির নাম:.....

ছবির নাম:.....

ছবির নাম:.....

ছবির নাম:.....

ছবিগুলো দেখা হলে তিনি বললেন,

- ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং উপরের ছবিগুলোর নিচের শূন্যস্থানে লেখ।
- ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পারো?

তারপর বললেন—চলো, এ প্রশ্ন দুইটির উত্তর আমরা দলগতভাবে খুঁজে বের করি। এরপর সবাই ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ১০ মিনিট আলোচনা করে প্রশ্ন দুইটির উত্তর লিখলো এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করলো।

চলো আমরাও ওদের মতো আমাদের বন্ধুদের সাথে দলগতভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি।

১. ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং ছবির নিচের শূন্যস্থানে লেখ।

.....

.....

২. ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পারো?

.....

.....

**বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব গঠন:**

সবার কাছ থেকে খুশি আপা জানতে চাইলেন যে,

- এসব সমস্যার পেছনে কার ভূমিকা রয়েছে?
- এসব সমস্যা দূর করতে হলে কাকে ভূমিকা পালন করতে হবে?

চলো আমরাও এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ভেবে বের করি

সবার উত্তর শুনে খুশি আপা প্রশ্ন করলেন যে,

- মানুষ হিসেবে আমাদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা?
- আমরা কীভাবে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি?

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো এতো বড় কাজটি কি আমরা একা একা করতে পারবো?

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, না, একা করা কঠিন হবে।

তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো? উত্তরে সবাই বললো যে, সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে। তখন সকলের উদ্দেশ্যে খুশি আপা বললেন-তাহলে আমরা বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি ক্লাব গড়ে তুলতে পারি কিনা, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে? এই প্রস্তাবে সবাই খুব আনন্দিত হয়ে উঠলো। আনচিং বললো, দারুণ হবে তাহলে আমরা অসহায় শুশুকদের রক্ষা করতে পারবো!
ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে স্বাধীন জিজ্ঞাসা করলো যে তাহলে, আমাদের ক্লাবের কাজ কী হবে?
এ পর্যায়ে সবাই ইনক্লুসনের নীতিমালা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়ে নিচে সংযুক্ত “শ্যামলী” নামের গল্পটি পড়লো।

## শ্যামলী

অনেক অনেক দিন আগের কথা। জায়গাটা কোথায় তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। একদেশে এক জলে থই থই মায়াবী নদীর ধারে খুব সুন্দর একটা গ্রাম ছিল। নাম ছিল তার শ্যামলী। গ্রামের একদিকে নদী আর বাকি তিন দিকে ছিল ঘন সবুজ বন। গ্রাম আর বনে ছিল রং বেরং এর ফুল আর গাছপালা। ঐ গ্রামে আর বনে গাছে গাছে উড়ে বেড়াতো সুন্দর সুন্দর সব কীট-পতঙ্গ আর পাখি। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো নানা রকমের বাহারি বন্যপ্রাণী। কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি আর মানুষ সবাই মিলেমিশে খুব সুখে শান্তিতে ছিলো।

কিন্তু হলো কী? কয়েক বছরের ব্যবধানে দেখা গেল যে প্রথমে আস্তে আস্তে বনে ঘাস আর ছোট ছোট গাছের সংখ্যা কমে যেতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে বড় বড় গাছপালার সংখ্যা আর বৃষ্টিও কমে যেতে লাগলো। গাছপালার সাথে সাথে কীট-পতঙ্গ আর পশু-পাখির সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো। আস্তে আস্তে বৃষ্টি এতই কমে গেল যে নদীতে পানিও শুকিয়ে যেতে থাকলো। চারপাশের সবুজ রং উধাও হয়ে শুকনো খট খটে বাদামি রং ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। নদীর পানি আর বৃষ্টি কমে যাওয়ায় ক্ষেতের ফসলও কমে যেতে লাগলো। আশংকা দেখা দিলো যে এ অবস্থা চলতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের মানুষের খাবারও কমে যাবে। গ্রামটির অবস্থা এমনই প্রাণহীন বিবর্ণ হয়ে গেলো যে বহু বছর পর যারা গ্রামটিতে বেড়াতে আসতো তারা প্রথমে দেখে চিনতেই পারতো না যে এটাই তাদের সেই শ্যামলী নামের গ্রাম!

সবাই শুধু এটাই বলতো যে কী সুন্দর গ্রামটা এখন কেমন হয়ে গেল! কিন্তু কেউই জানতো না কী করলে শ্যামলী গ্রামের হারানো প্রাণ আবার ফিরিয়ে আনা যায়। এমনই যখন অবস্থা, তখন ঐ গ্রামের একদল ছেলেমেয়ে চিন্তা করলো এ অবস্থার একটা পরিবর্তন দরকার! ঠিক করলো তারা তাদের গ্রামের হারিয়ে যেতে বসা সবুজ গাছপালা, রং বেরং এর পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ আর জল থই থই নদী আবার ফিরিয়ে আনবে কিন্তু তারা জানে না কীভাবে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব? একদিন তারা সবাই বসলো আলোচনার মাধ্যমে একটা উপায় খুঁজে বের করতে। চিন্তা করে দেখলো তারা আসলে সমস্যাটা সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই জানে না। আর তাই সেগুলো সমাধানও করতে পারছে না। ভেবে ভেবে তারা কয়েকটি বিষয় বের করলো যার উত্তর না জানলে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব নয়। বিষয়গুলো হচ্ছে-

- আগে বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কেমন ছিলো?
- এখন বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কেমন আছে?
- কেন বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কমে গেল?
- কি করলে আবার বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ বাড়ানো যাবে?

সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করতে পেরে তারা ভীষণ খুশি হলো। এবার তারা ভাবতে শুরু করলো কীভাবে, কোথায় গেলে, কার কাছে থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারে। তারা তাদের শিক্ষকের কাছে জানতে পারলো যে, তাদের গ্রামে যে বন বিভাগের অফিস আছে ওরা বনের পশুপাখি আর গাছপালা নিয়ে কাজ করে। ওদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষকের কথামতো ওরা বন বিভাগের লাইব্রেরি ঘেঁটে অনেক বই আর রিপোর্ট খুঁজে পেল যেখানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যেতে পারে। বই আর রিপোর্টগুলো নিয়ে তারা সবাই মিলে বেশ কিছু দিন পড়াশোনা করার পর তাদের বন আর বনের গাছপালা ও পশুপাখি বিষয়ক অনেক কিছু জানতে পারলো। কিন্তু মুশকিল হলো, যে বিষয়গুলো জানতে পারলো সবাই তাদের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও সরাসরি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বই ও রিপোর্টগুলো থেকে তারা সমস্যা তৈরি হওয়ার আগে বনের গাছপালা ও পশুপাখির সংখ্যা কত ছিলো আর বর্তমানে এই সংখ্যা কত তা সবই জানতে পারলো। তারা খেয়াল করলো যে শুরুতে হঠাৎ করেই বনে নেকড়ের সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। তারপর বনে দ্রুত গাছপালার সংখ্যা কমতে থাকে, এদিকে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু এসব কিছুর সাথে শ্যামলী গ্রামের সমস্যার কোন সরাসরি যোগাযোগ তারা খুঁজে পায় না।

সবকিছু নিয়ে তারা আবার হাজির হয় শিক্ষকের কাছে। সব শুনে শিক্ষক তাদের বললেন যে, এখন আসলে তাদের কথা বলতে হবে এমন একজন মানুষের সাথে যিনি বন আর বনের পশুপাখিদের সম্পর্ক খুব ভালো বোঝেন। সৌভাগ্যক্রমে তাদের গ্রামে এমন একজন আছেন যিনি বন্যপ্রাণী আর পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করেন। ছেলে-মেয়েরা তখন ছুটলো সেই গবেষকের কাছে। গবেষক তাদের সব কথা আর প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, তোমাদের কথা শুনে আমি মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। এক সময় বনে সব

ধরনের গাছপালা আর পশুপাখিই একে অপরের উপর নির্ভর করে শান্তিতে বসবাস করছিলো। যেমন ঘাস আর গাছপালা খাবারের জন্য নির্ভর করে মাটির উপর, হরিণ, গরু, মহিষ এরা বেঁচে থাকে ঘাস লতাপাতা খেয়ে। অন্যদিকে নেকড়েরা খাবারের জন্য শিকার করতো হরিণ, গরু, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীদের। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই যখন গ্রামের একদল শিকারী নিরাপত্তার অজুহাতে সব নেকড়েকে মেরে ফেলে।

শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসা করলো, নেকড়ের সংখ্যা কমে যাওয়ার সাথে সমস্যার শুরুর সম্পর্কটা কী? তিনি তখন বললেন খেয়াল করে দেখ, বনের সব পশুপাখি আর গাছপালাই একে অপরের উপর নির্ভর করে বাঁচে। নেকড়েগুলো খাবারের জন্য শিকার করতো হরিণ, গরু, মহিষ আর অন্য তৃণভোজী প্রাণীদের। বনে যখন আর কোনো নেকড়ে থাকলো না তখন হরিণসহ তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেল। এই জন্যই তোমরা রিপোর্টগুলোতে পেয়েছো যে, যখন নেকড়ের সংখ্যা কমেছে তখন তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা বললো, এবার বুঝেছি! আর তৃণভোজীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতেই গাছপালার সংখ্যা কমে গেছে দ্রুত। কারণ, বেশি সংখ্যক তৃণভোজীরা বেশি বেশি গাছপালা খেয়ে ফেলেছে। গবেষক বললেন, একদম ঠিক ধরেছো। আর গাছপালা কমে যাওয়াতেই এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে গেছে। ফলে নদীর পানিও কমে গেছে। চারপাশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারা খুব উৎফুল্ল হয়ে বললো, এখন আমরা সমস্যাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বের করতে পেরেছি। এবার আমাদের বের করতে হবে, কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যাবে।

একজন বললো, তাহলে আমরা অনেক গাছ লাগিয়ে দিতে পারি যাতে আবার বৃষ্টিপাত বেড়ে যায়! কিন্তু বাকিরা বললো তাহলে তো তৃণভোজীরা আবার সেগুলো খেয়ে ফেলবে। তার চেয়ে বরং আমারা বনে কিছু নেকড়ে ছেড়ে দিতে পারি তাহলে ওরা তৃণভোজীদের সংখ্যা কমিয়ে বনের পরিবেশে আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে। আর তখন গাছপালা, কীটপতঙ্গ, বৃষ্টিপাত আর নদীর পানি সবই বেড়ে যাবে। সেই সাথে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো, পশুপাখির আবাস নির্মাণ এবং খাবারও নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে পারি। একজন শিক্ষার্থী বললো, গ্রামবাসীদেরও সতর্ক করতে হবে যেন কেউ একটা প্রাণীকে অপ্রয়োজনে হত্যা না করে! কিন্তু এটা তো জটিল একটি কাজ আমরা কীভাবে সেটা করতে পারবো? তখন সবাই আবার গেলো শিক্ষকের কাছে।

শিক্ষক তাদের বললেন চিন্তার কোন কারণ নাই। তোমরা যদি বন বিভাগে তোমাদের অনুসন্ধানের রিপোর্টসহ আবেদন করো, তাহলে বন বিভাগ অন্য বন থেকে নেকড়ে ধরে এনে আমাদের বনে ছেড়ে দিতে পারে। সবাই তখন খুশি হয়ে গেলো একজন বলে উঠলো আর বাকি কাজগুলো তো আমরাই সবাইকে সাথে নিয়ে করে ফেলতে পারবো। শিক্ষার্থীরা তাই করেছিল। ফলাফল হলো কয়েক বছরের মধ্যেই শ্যামলী গ্রামের হারানো প্রাণ আবার ফিরে এসেছিল। গ্রামবাসীও খাবারের অভাব থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

গল্পটি পড়া শেষ হলে খুশি আপা তাদের বললেন চলো আমরা গল্পটি থেকে এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

- শ্যামলী গল্পের শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার সমস্যাটি কীভাবে চিহ্নিত করেছিল?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কী করেছিল?
- সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল?

চলো আমরাও "শ্যামলী" গল্পটি পড়ে গল্পটি থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

১. শ্যামলী গল্পের শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার সমস্যাটি কীভাবে চিহ্নিত করেছিল?

.....

.....

২. সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কী করেছিল?

.....

.....

৩. সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল?

.....

.....

সব দল তাদের উত্তর উপস্থাপন করার পর খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, তারা তাদের ক্লাবের জন্য কী ধরনের কাজ নির্ধারণ করতে চায়?

এ পর্যায়ে সবাই-

আবারও ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত হয়ে ক্লাবের কাজ কী হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করলো। দলে কাজ করা শেষ হলে প্রত্যেক দল তাদের তালিকা পোস্টার পেপারসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করলো। উপস্থাপনার সময় সবাই আলোচনার মাধ্যমে সব দলের তালিকা থেকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নযোগ্য এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো যে, ক্লাবের সদস্যরা একক ও দলীয়ভাবে সারা বছর ধরে তা বাস্তবায়ন করবে।

চলো এবার আমরাও নিজেদের মতো করে নিজেদের এলাকার বাস্তবতা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করি

(নিচে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হলো বোঝার সুবিধার্থে, আমরা চাইলে এগুলো রাখতেও পারি আবার বাদও দিতে পারি)

- ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ
- বন্য পশুপাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ
- নিজের বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় ময়লা- আবর্জনা ব্যবস্থাপনা
- ----------
- ----------
- ----------

কাজের তালিকা তৈরি শেষ হলে, খুশি আপা বললেন, কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো! চলো এবার আমরা ক্লাবের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটির গঠন অর্থাৎ

- মোট সদস্য সংখ্যা,
- কী কী পদ/পদবি থাকবে,
- তাদের কার কী কাজ হবে
- সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে
- সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে

সে বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরি করলো এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করলো। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো ও অধিকার এবং দায়িত্বের বিবরণী তৈরি করলো। তারা ভেবে দেখলো যে কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং। এ কাজে তাদের মাঝে মাঝে বড়দের পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই তারা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলো, কেননা তাঁরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সাথে যুক্ত বিষয়গুলো ভালো জানেন।

এরপর তারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কমিটি গঠন সম্পন্ন করলো। নতুন কমিটি দ্রুতই তাদের প্রথম মিটিং এর তারিখ নির্ধারণ করলো এবং প্রথম মিটিং এ তারা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলো।

চলো আমরাও আমাদের বন্ধুদের সাথে মিলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের কমিটির গঠন কেমন হবে তা ঠিক করি এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটির সদস্য বাছাই করি।

# মূল্যায়ন:

এবার চলো আমরা নিচে যুক্ত আত্মমূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে বন্য প্রাণী সংক্ষণ ক্লাবের সাথে আমাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করি।

| ক্রম | ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর | সম্পূর্ণ একমত | মোটামুটি একমত | একমত নই |
|---|---|---|---|---|
| ১। | আমি অন্তত: পক্ষে ৩টি স্থানীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী সম্পর্কে জানতে পেরেছি | | | |
| ২। | আমি/আমরা-প্রাণী/বন্যপ্রাণি/পরিবেশ রক্ষায় অন্তত: পক্ষে ১টি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি | | | |
| ৩। | বন্যপ্রাণি সম্পর্কে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে | | | |
| ৪। | বন্যপ্রাণির প্রতি আমার ভালবাসা আগের চেয়ে বেড়েছে | | | |
| ৫। | আমি ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণি ও পরিবেশ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ | | | |
| ৬। | আমি বিশ্বাস করি আমার কাজে ক্লাব উপকৃত হয়েছে | | | |
| ৭। | বন্যপ্রাণি ও পরিবেশ কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পেরেছি | | | |
| ৮। | বন্যপ্রাণি ও পরিবেশের বিলুপ্তির অন্তত: ৩টি কারণ সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি | | | |